প্রথম অধ্যায়

রমাপদ চৌধুরী : ব্যক্তি ও সৃষ্টি

বিশ্বায়ন পরবর্তী বাজার অর্থনীতির প্রবাহে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ধারণার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। ব্যক্তিমানুষ তার গোষ্ঠীচেতনা থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে হয়ে উঠেছে আরও আত্মকেন্দ্রিক আরও বিপন্ন ও অন্তঃসার শূন্য। তাৎক্ষণিক ভোগ বাসনার কারণে আপন মুদ্রাদোষে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থান তৈরি করেছে নিজেই। ভারতবর্ষীয় সমাজ মানসের এই বিপন্নতার পর্বান্তরের একটি পর্ব বলা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত — যুদ্ধ পরবর্তী মন্বন্তর, দাঙ্গা, এরপর দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। অস্থির সময়ের এই ঘূর্ণাবর্তে জীবনসত্যের সহজাত গতিবিধি যার কলমে অন্য মাত্রা পেল তিনি চল্লিশের অন্যতম কথাকার রমাপদ চৌধুরী। জন্ম ২৮ ডিসেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩ পৌষ ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তৎকালীন খড়গপুরের গ্রামীণ জীবনে। ডাক নাম তিমু। স্কুল জীবনে প্রবেশের পূর্বে —

> ‘‘সে চাঁদমারির ঘন সবুজ রঙের ঘাসে ঢাকা ময়দানে একটা কাঁচের শিশি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর কচি ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা বীরবাবটি ধরে পুরত সেই শিশিটিতে। ঝকঝকে লাল রঙের বেশ শক্ত আবরণে ঢাকা পিঠের ওপর একটা কালো টিপ, কী সুন্দরই না দেখতে পোকাটা। রোজই দু’চারটে বীরবাবটি শিশিতে পুরে মাকে এনে দেখাত, আর মা বলতেন, শিশিতে ভরে রাখলে ওরা নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, খেতেও পারে না, মরে যাবে। এত সুন্দর পোকা যদি তোর হাতে বন্দি থেকে মারা যায়, তাহলে ভগবান তোর ওপর রাগ করবেন। ভগবান কি তা তিমু জানত না, দেখেওনি কোনদিন তাকে বাড়িতে। তাই, অজানা একটা ভয়ে সে মায়ের কথা মেনেই পোকাগুলিকে আবার ছেড়ে দিয়ে আসত সেই চাঁদমারির বিশাল মাঠে . . .।’’[১]

বীরবাবটি ধরা আর সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে চাঁদমারির মাঠে চষে বেড়ানো দুরন্ত তিমুকে তাঁর বাবা একদিন রেলওয়ে স্কুলে সোজা দাদুর অফিসে নিয়ে গেলেন। তিমুকে তাঁর দাদুর স্কুলে ভর্তি করানো হল। স্কুলের খাতায় তাঁর নাম হল রমাপদ চৌধুরী। দুটো নামই তাঁর দাদুর দেওয়া —

> ''তিমুকে দাদু বললেন, দাদুভাই, আজ থেকে তোমার ভাল নাম
> ইস্কুলের খাতায় হল, রমাপদ চৌধুরী আর বাড়িতে তিমু।''[২]

স্কুলে ভর্তি হলেও পাঠ্যপুস্তকের দিকে তিমুর একটুও মন ছিল না। তাঁর মন চলে যেত পাঠ্যপুস্তকের বাইরের পড়ার দিকে। তিমুর এই স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন পিতা তারাপ্রসন্ন চৌধুরী। তিনি ছিলেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সিনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট, পরবর্তীতে চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার। পিতা তারাপ্রসন্ন চৌধুরী বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম.এস.সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই সিমলায় অধ্যাপনার সুযোগ আসে এবং তিনি তাতে যোগ না দিয়ে গ্রামেই স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে কিছুটা বাধ্য হয়েই রেলওয়ে অডিট অফিসের পরীক্ষা দিয়ে চাকরি নিয়েছিলেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে। এরই সূত্রে রমাপদ চৌধুরীর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা আধফোটা শহর খড়গপুরে। বনজঙ্গল কেটে শক্ত পাথুরে জমিকে সমতল বানিয়ে শহর তৈরির তৎপরতা চলছে তখনও। ফলে না শহর, না গ্রাম খড়গপুরে—

> ''জোড়া জোড়া অসংখ্য রেললাইন পাশাপাশি পূবে পশ্চিমে
> ছুটে গেছে, রাতের আলোয় ওভারব্রিজের মাথা থেকে দেখলে
> মনে হত যেন অসংখ্য ছুরির ফলা মাটি ফুরে বেরিয়ে এসে
> শহরটাকে দু-টুকরো করে দিয়েছে। একদিকে হাজার কয়েক
> ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, আর একদিকে হাজারে
> হাজারে পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি, গুজরাতি, বাঙালি। আর দূরে দূরে
> অন্ধ্রবাসী বা ছত্তিশগড়িদের, বিহারি মুসলমানদের শ্রমিক পল্লী।''[৩]

নানা ভাষা এবং জাতির সমন্বয়ে খড়গপুর যেন নতুনভাবে গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমশ তৈরি হল

এক মিশ্র সংস্কৃতির। এ বিষয়ে লেখকের মন্তব্য —

> ‘‘ফলে তৈরি হয়েছিল এমন এক মিশ্র সংস্কৃতির — যা না ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার না ফিউচাল কালচার আর এই সংস্কৃতির এমন কোনো শক্তি ছিল না যে সেই উপনিবেশ আশ্রিত প্রতিটি মানুষকে সংযুক্ত করে রাখার প্রেরণা যোগাতে পারে। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন রুচির এবং অবশ্যই বিভিন্ন কালচারের মানুষের অ্যাকুমিউলেশন ঘটেছিল রেল কারখানাকে কেন্দ্র করে।’’[৪]

এই রেল কারখানাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন বহু পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তেমনি বহু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছিল রমাপদ-র জীবনে। বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার মানুষের সংস্পর্শ তাঁর জীবনে ভিন্ন মাত্রা দান করেছিল। কৈশোর জীবন থেকেই সুন্দর মনন ও মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তবে এ ধরনের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক আবহেও তাঁর প্রকৃত বন্ধুর অভাব ছিল। চাঁদমারির মাঠ ও হিজলীর বনে সামান্য সময়ের ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গী হয়তো জুটেছিল কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠার মতো কেউই জোটেনি তখনও। কেননা —

> ‘‘. . . সকলের মনে ছিল এমন একটা ধারণা, রেল কলোনির সঙ্গে আমার যোগাযোগ তো কেবল রেল কারখানার চাকরিটুকুই, এর বেশি কিছু নয়। ফলে ‘সেনস্ অফ বিলঙ্গিঙ’ বলতে যা বোঝায় সেরকম কোনো আত্মিক সংযোগ ছিল না কারোর মধ্যেই। আর এখান থেকেই আমার নিঃসঙ্গতার সূত্রপাত ঘটে গিয়েছিল।’’[৫]

ফলে সঙ্গীহীন রমাপদ-র জীবনে একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠল বই। বই-এর প্রতি আগ্রহ আরও দৃঢ়তর হয়ে ওঠার কারণ হল তৎকালীন রাজনৈতিক বিপর্যয়— অসহযোগ আন্দোলন এবং এরই পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যাকাণ্ড। বলাবাহুল্য, সমস্ত শহর জুড়েই

শুরু হয় কারফিউ। সূর্যাস্তের পর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত এলাকা নীরব হয়ে আসে। নীরবতার এমন মুহূর্তে বাঙালি হওয়ার অপরাধে পথে সাইকেল চালানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। কাজেই নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য রমাপদ যে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তাঁর সেই সাধের সাইকেলখানাও এই অলিখিত আইনে বাজেয়াপ্ত করা হয়। নিঃসঙ্গতার ক্রমান্ধকার কেবলই ঘনীভূত হতে থাকে। স্বভাবতই নিরুপায় নিঃসঙ্গ রমাপদ তাঁর একমাত্র সঙ্গী হিসেবে বইয়ের অঙ্গনকেই বেছে নিলেন। ফলে বই পড়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তার একাকীত্বকে দূরীভূত করার চেষ্টা চলছিল অন্যদিকে তারই মধ্য দিয়ে সাহিত্যের ঈশানকোণও তার যথাযথ ভিত্তিভূমি তৈরি করে নিয়েছিল। বই পড়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ দেখে তাঁর পিতা খুশি হয়ে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বাড়ির বইয়ের আলমারির চাবি। পিতার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য জগতের সন্ধান পেলেন রমাপদ চৌধুরী। আর সে জগতের পরিধি আরও বিস্তৃত হল বাবার কাছ থেকে রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরির ছাড়পত্র পেয়ে। এই সময়েই তিনি বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বই আত্মস্থ করে নেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত লেখার জগতে তিনি কলম ধরেননি। কেবল পাঠক হিসেবেই নিজেকে ক্রমাগত নির্মাণ করে চলেছিলেন।

স্কুলজীবনেই রমাপদ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন। খুব কাছ থেকে গান্ধীজীকে দেখেছিলেন গুজরাতি স্কুলে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শুনেছিলেন স্ট্রাইক ময়দানে দাঁড়িয়ে। রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি যিনি পূর্ববর্তী জীবনে গিরিসাহেব নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁকেও দেখেছেন একেবারেই কাছ থেকে। কারণ রমাপদ-র বাবার কাছে গিরি সাহেবকে আসতে হত। কিন্তু এ সমস্তকিছুর কোনটিই তাঁর মনে রেখাপাত করেনি। আজীবন যে দৃশ্যটি তাঁর বুকে লালিত ছিল তা হল এক নৈসর্গিক সূর্যোদয়ের প্রভাতবেলা। যে প্রভাত স্বচ্ছ অথচ নির্লিপ্ত। যে ভোর তার সমস্ত আলো বিকীর্ণ করে দিয়েছিল ট্রেনের কামরার এক জানালায়, মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেই চেহারা, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন —

"... আমার কাছে এসবের প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক। চোখ

বুজলেই আমি শুধু সেই ভোরের প্ল্যাটফর্ম দেখতে পেতাম।
সেই ট্রেনের কামরার জানালাটুকু।”[৬]

খড়গপুরে স্কুল জীবন সমাপ্তির পূর্বেই রমাপদ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রথম এলেন কলকাতায়, তাঁর সিট পড়েছিল হেয়ার স্কুলে। সেখানেই প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজি সিনেমা ও তার পাশাপাশি শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে বাংলা সিনেমা দেখে শরৎচন্দ্রের লেখালেখির প্রতি আকৃষ্ট হন। রমাপদ-র দিদির বাড়ি ছিল বিলাসপুরে, সেখানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগে রমাপদ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেখানে কাটানো দিনগুলোতেই তিনি এক এক করে পড়ে নেন কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, অন্নদাশঙ্কর, তুলসীদাস, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর আই.এ পড়ার জন্য তাঁকে ভর্তি হতে হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে, নতুন ঠিকানা নির্ধারিত হয় ‘হিন্দু হোস্টেল’। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েই এতদিনকার নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো রমাপদ-র জীবনে প্রায় সম মানসিকতা সম্পন্ন দু’জন বন্ধু পেয়েছিলেন। তাঁদের একজন প্রেসিডেন্সিরই ছাত্র প্রাণতোষ ঘটক, অপরজন বিদ্যাসাগর কলেজের স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই বন্ধুই লেখক। ছাপা না হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁরা নিয়মিত লেখা পাঠান। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সুবাদে তাদের লেখা পড়ে নানারকম মন্তব্য করার অধিকারও অর্জন করেন রমাপদ। কিন্তু সমালোচনার সামান্য বিভ্রান্তিও যে কী হতে পারে তার ফল রমাপদ চৌধুরীর কলমে ফুটে উঠেছে —

“কলেজের ফার্স্ট ইয়ারেই দু’জন বন্ধু জুটল, যাদের মনে সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা . . . ওরা লেখে, লেখা পাঠায়। নানান কাগজে। ছাপা অবশ্য হয় না। বোধহয় হালকাভাবে কিছু বলেছিলাম ওদের, ওরা বলে বসল, বরং নিজেই তুই লেখ না একটা গল্প, লিখে দেখিয়ে দে।”[৭]

সমালোচনার বিপাকে পড়ে বন্ধুদের জন্যেই গল্প লেখায় হাত দিলেন তিনি। তবে গল্প লেখার পর্ব এখান থেকে শুরু হলেও তাঁর লেখক জীবনের প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল স্কুলজীবনে

কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। স্কুলজীবনেই একবন্ধুর বাড়িতে 'মাসিক রামধনু' পত্রিকা পড়ে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন তিমু। ছড়ার কবিতা তাঁর মনকে এতই আকর্ষণ করত যে শেষপর্যন্ত নিজেও ছড়ার কবি হয়ে ওঠার আনন্দ অনুভব করতেন। একের পর এক কবিতা লেখা ও পত্রিকা সম্পাদকের দপ্তরে পাঠানো এবং সেইসঙ্গে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর চিঠি। অবশেষে 'রামধনু'-তে ছাপা হয় তাঁর কবিতা। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে আনন্দিত হওয়ার চেয়েও তখন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে ওঠে কবিতার অবয়ব। কারণ বারো লাইনের কবিতার শুধু প্রথম এবং পঞ্চম চরণটিই শুধু নিজের, বাকিটা সম্পূর্ণই অপরিচিত। এ যেন —

> ''বন্ধুর নতুন কেনা বইয়ে আনমনে নিজের নাম লিখে ফেলেছি। দুঃখটা বিকেলের দিকে সয়ে এল। দুঃখের বদলে তখন রাগ। মূর্খ — মূর্খ সব। কিচ্ছু বোঝে না সম্পাদকরা। আমার এমন সুন্দর কবিতাটা কিনা কেটেকুটে নষ্ট করে দিল। এর চেয়ে না ছাপলেই ভালো ছিল।''[৮]

কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এই যে ইতিহাস সেই সম্পর্কে লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন —

> ''প্রথম যৌবনে দেখা কোনও মেয়ের মুখ ভালো লাগেনি যে কোনও লোকের পক্ষে যতখানি মিথ্যাচার, তার চেয়ে বড় অসত্যকথন সম্ভবত কোন সাহিত্যিকের পক্ষে বলা যে, তিনি কখনও কবিতা লেখেননি।''[৯]

সে যাই হোক, এই স্কুলজীবনেই কিন্তু তিনি একটি উপন্যাসও লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর বাস্তবজীবনেই ঘটে যাওয়া এক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। স্কুলের এক বন্ধুর মা যাকে রমাপদ সুন্দরমাসি বলে সম্বোধন করতেন, সেই সুন্দরমাসির আত্মহননকে কেন্দ্র করে একটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'চোরাবালি'। প্রসঙ্গক্রমে লেখক উল্লেখ করেছেন—

> ''সুন্দরমাসির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন রাত্রে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা টেনে নিয়ে প্রথম পাতাতেই নাম লিখেছি

বড় বড় হরফে — 'চোরাবালি'। . . . হাতের লেখার নব্বই পৃষ্ঠার উপন্যাসখানা শেষ করেছিলাম।"[১০]

বাড়ির লোকজন ও আত্মীয়স্বজনদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সকলের অগোচরেই সেই উপন্যাসটি উনুনে গুঁজে দিয়েছিলেন —

"... একদিন দুপুরবেলায় সকলে যখন ঘুমোচ্ছে, রান্নাঘরের উনুনে খাতাটা পুরে দিয়ে খানিকটা কেরোসিন তেল ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দিলাম। ঠিক যেভাবে সুন্দরমাসি নিজের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।"[১১]

কিশোর তিমুর কবিতা ও উপন্যাস লেখার জগৎ স্কুল জীবনে শুরু হয়ে আবার স্কুল জীবনেই মিলিয়ে গেল, আর কলেজ জীবনে বন্ধুদের জোরে গল্প লেখার সূত্রপাত —

"১৯৪০-এর কর্মব্যস্ত এক দুপুর। প্রেসিডেন্সি কলেজের পাশের গলিতে পাবলিক রেস্টুরেন্টের পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে এক মনে মাথা নিচু করে লিখে চলেছে কলেজ পড়ুয়া এক সদ্য যুবক। বাইরে প্রহরারত বন্ধুর দল। বস্তুত তারাই জোরজার করে ছেলেটিকে বসিয়ে দিয়ে গেছে ওই কেবিনে, টেবিলে রেখে গেছে দু প্যাকেট ক্যাপস্টান সিগারেট, তাকে শুনিয়ে ম্যানেজারকে বলে দিয়েছে চায়ের যোগান যেন বন্ধ না হয়, আর এই সমস্ত কিছুর পরিবর্তে একটাই শর্ত — গল্প লিখতে হবে। বন্ধুদের লেখালেখির নিয়মিত সমালোচক তরুণটি আজ তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই লেখকের ভূমিকায়। সময় গড়িয়ে যায়, ফুরিয়ে আসে সিগারেট, বাইরে বন্ধুদের কলকাকলি কানে এসে পৌঁছালেও মনে দাগ কাটে না — কী এক নেশায় পাওয়া মানুষের মতো ছেলেটি কেবল লিখেই চলে, আর ঘণ্টা দুয়েক

পর বাইরে বেরিয়ে এসে কলেজের নোট লেখার খাতা থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় এক বন্ধুর দিকে, বলে, 'নে তোর গল্প'।"[১২]

সপ্তাহখানেক পর সেই গল্প 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওয়াই.এম.সি.এ রেঁস্তোরাতে প্রথম গল্প 'ট্র্যাজেডি'র মধ্য দিয়ে যে পথচলা শুরু হয়েছিল রমাপদ-র সেই গতি আর থামে নি। একের পর এক গল্প লিখেই চলেছেন 'উদয়াস্ত' (১৩৫০), 'রত্নকূট' (১৩৫২), 'সহযোগ' (১৩৫২), 'বনবাতাস' (১৩৫২), 'কুসীদাশ্রিত' (১৩৫২), 'চন্দ্রভস্ম' (১৩৫২), 'শিশুমেধ' (১৩৫৩), 'বাবুই' (১৩৫৫), 'তিনতারা' (১৩৫৫), 'স্বর্ণমারীচ' (১৩৫৫) ইত্যাদি। এভাবেই তাঁর গল্প লেখার ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। সময়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জীবন নির্ভর বিষয় নিয়ে বিভিন্নভাবে তাঁর লেখা গল্পগুলো ঐকান্তিকভাবে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে। বাস্তবজীবন নির্ভর বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পের উৎসমূলে তাঁর স্কুল জীবনের সারা ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। লেখক অকপটে তা যেন স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায় —

"এতখানি বিশ্বাসের মূলে ছিল আমার ভারতভ্রমণের পুঁজি, কত অভিজ্ঞতা, কত মজার মজার গল্প। বাবা ছিলেন ভ্রমণবিলাসী, তাই সারা ভারত ঘুরে নিয়েছি স্কুল জীবনেই।"[১৩]

নিয়মিত দেখা জগৎ থেকেই তাঁর গল্পের কাহিনি ও চরিত্রগুলো উঠে এসেছে। তাঁর মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক গল্পগুলোর কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যায় সেখানেও তাঁর আশপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জীবন্ত ছবি। রমাপদ-র 'এক পাটি জুতো' গল্পের মধ্যেও দেখা যায় গল্পকথক তার আড়াই বছরের শিশুকন্যাকে একজোড়া নতুন জুতো কিনে দেয় এবং মেয়ে রাগ করে তার একপাটি রাস্তায় ফেলে দেয় ঠিকই কিন্তু কথক বাবা সেই জুতোর একপাটি উদ্ধার করেন গলির মোড়ের দোকান থেকে, দাম বারো আনা। অর্থাৎ একজোড়া জুতোর দাম যা একপাটি জুতোর দামও তাই হয়ে দাঁড়ায়। অভিমানী গল্প কথক অবশিষ্ট একপাটি জুতো রাস্তায় ফেলে দিয়ে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে অবশেষে অপর পাটি উদ্ধার করে আনেন। আসলে সেই

প্রেক্ষিতে গল্প কথকও অনুভব করতে পারেন জিনিস ও টাকার মূল্যের যথাযথ অবস্থান। এইভাবেই পর পর উঠে আসে 'আমি একটি সাধারণ মেয়ে' (১৩৬৬), 'টাকার দাম' (১৩৬৬), 'শুধু কেরানী' (১৩৬৬), 'বসবার ঘর' (১৩৭৪), 'ফ্রীজ' (১৩৭৫), 'চাবি' (১৩৭৫), 'ডাইনিং টেব্‌ল' (১৩৭৬), 'ড্রেসিং টেব্‌ল' (১৩৭৬) ইত্যাদি গল্পগুলো।

শুধু গল্প নয়, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও একই অনুষঙ্গ কাজ করেছে তার লেখক মানসে। যে-কারণে তিনি লিখলেন প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর'। কৈশোর কাল থেকে দেখে আসা অরণ্যজঙ্গল, কাঁকড়ে লালমাটি ও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে আসা আধফোটা শহর খড়গপুর।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রমাপদ ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। এরপর কয়েকবছর তিনি ঘি, মাছ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ এবং বীমা কোম্পানির সংগঠকের কাজও করেন। এই সময়েই তিনি 'ইদানীং' এবং 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা' নামে দুটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় যোগ দেন এবং 'রবিবাসরীয়' বিভাগটি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর তিন বছর পর সহকারী সম্পাদক হিসেবেও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে একসঙ্গে 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এই সময়সীমায় রমাপদ-র উপন্যাস লেখা শুরু। তিনি যখন প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' লিখছেন তখন তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। 'প্রথম প্রহর' বই হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৩৬১ সালে। 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসটি তাঁর নিজেকে নিয়েই লেখা। রমাপদ-র শৈশব কৈশোরের স্মৃতি নানাভাবেই এই উপন্যাস রচনায় রসদ জুগিয়েছে — চাঁদমারির ময়দান, কাঁকড়ের লালমাটির রাস্তা, সাহেবপাড়ার আভিজাত্য, উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারদিক বেষ্টিত রেল কারখানা, চেনা মুখের স্রোত এবং তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা ক্রমান্বয়ে ভীড় করে লেখকের মানসপটে। কথক 'আমি'র সঙ্গে তার বাল্যসখীর হঠাৎ করে ট্রেনে দেখা এবং উপন্যাসের শেষ অবধি তাকে চিনতে না পারলেও তারই কথাবার্তায় নানাভাবে অনেক স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের মনের মণিকোঠায়। উপন্যাসের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে তিমুর আটবছরের জন্মদিন থেকে এবং শেষ হয়েছে তিমুর বয়ঃসন্ধির শেষ প্রান্তে। এই তথ্যের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আমাদের এতটুকু

বুঝতে অসুবিধে হয় না। তিমুর এই যে আটবছর থেকে শুরু করে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত বেড়ে ওঠার কালসীমায় তাঁর চারপাশের নানা পরিবর্তন, এইসব পরিবর্তনকেই খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন কথাকার রমাপদ চৌধুরী।

প্রথম গল্প 'ট্র্যাজেডি' লেখার পর যেমন তাঁর গল্প লেখার পর্ব চলমান ছিল, তেমনি প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' লেখার পরও তাঁর উপন্যাস লেখার ধারাও অব্যাহত ছিল। এরপর তিনি লেখেন 'লালবাঈ' (১৩৬৩), 'অরণ্য আদিম' (১৩৬৪), 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (১৩৬৪), 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' (১৩৬৭), 'দুটি চোখ দুটি মন' (১৩৬৮), 'বনপলাশির পদাবলী' (১৯৬২), 'পরাজিত সম্রাট' (১৯৬৬) ইত্যাদি। সময় যত পাল্টেছে ততই পাল্টে গেছে তাঁর লেখার বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিক। ফলে প্রথম যৌবনের রোমান্টিক ভাব তরঙ্গের কাহিনিমূলক গল্প ও উপন্যাস পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও সময়ের দাবিতেই সেই বিষয় থেকে তিনি নিজেই বেরিয়ে এসেছেন। কাহিনির পরিবর্তে বিষয় বড়ো হয়ে উঠে এসেছে গল্পের কেন্দ্রে। নিছক গল্প বলার মতো গল্প রচনা থেকে বিরত রেখেছেন নিজেকে। এ বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> "... একসময় এই বৈচিত্র্যের ঘোর কেটে গেল। হঠাৎ-ই মনে হল এদের সকলকেই আমি অনেক দূর থেকে দেখেছি। তাদের বাইরের চেহারাটুকুই চোখে পড়েছে। চরিত্রের ভেতরে ঢুকলাম কই? নীচুতলার চাষী, কয়লাখনির শ্রমিক সাঁওতাল মুণ্ডার জীবন এসব নিয়ে কল্পনার গল্প সাজিয়েছি। এসব লেখা প্রচুর প্রশংসাও পেয়েছে। পাঠক চরিত্রগুলোকে জীবন্ত মনে করেছে। কিন্তু আমি তো জানি ফাঁকি কোথায়। আমার মনে হতে লাগল, ঐসব চরিত্ররা সত্যিই ঐ রকম? ... হ্যাঁ, আমি তখন নিজের দিকে চোখ ফেরালাম। নিজেকে চেনার চেষ্টা করলাম। আমার চারপাশে প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সহকর্মী অর্থাৎ গোটা শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত সমাজটাকেই দেখতে শুরু করলাম। তাদের ঈর্ষা লোভ সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি ভাল থাকতে না পারার বেদনা, হেরে যাওয়া, জিতে যাওয়া — এসবই চোখে পড়লো। তাই দূর থেকে দেখা জিনিস কল্পনায় সাজিয়ে আর লিখতে ইচ্ছে করলো না। আমার যেটুকু কল্পনাশক্তি তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে পড়লো।"[১৪]

খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের দুটো পর্ব আমরা লক্ষ করি। প্রথমদিকের গল্প উপন্যাস জুড়ে পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবন বিশেষত নিজের শৈশব, বাংলা-বিহার সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজজীবন ও খড়গপুরের জীবন বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান। এরপর দেশভাগ পরবর্তীকালের বিভিন্ন গল্প এবং বলা যায় 'খারিজ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতই মধ্যবিত্ত জীবনবৃত্তে প্রবেশ। এই পরিবর্তন আসলে লেখকের সময়বাহিত পরিণত ভাবনার ফসল। একজন মানুষকে তার সংকীর্ণতা বা অসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে আত্মজিজ্ঞাসা বলা যেতে পারে। যে জিজ্ঞাসা ব্যক্তিকে ব্যষ্টির চেতনায় জাগিয়ে তোলে।

এই পর্বের উপান্তে এসে বলা যায়, স্বল্পভাষী, আত্মপ্রচারবিমুখ এই অনন্য কথাকার আজও লিখে চলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বছরে একটি উপন্যাস লেখেন, গল্পও সংখ্যায় কমই লেখেন। আজও তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তিনি স্বভাবতই স্বতন্ত্র। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি এভাবেই আরও উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্ম দিন, বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার তাতে আরও সমৃদ্ধ হবে, আমাদের মনন হবে ঋদ্ধ— এটুকুই প্রত্যাশা।

সূত্রনির্দেশ :

১. নন্দদুলাল রায়চৌধুরী, 'তিমুকে মনে করে', উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয়, ১৪২০, পৃ. ১৭।

২. তদেব, পৃ. ১৯।

৩. রমাপদ চৌধুরী, 'ঋষি, দস্যু, এক কিশোর বালক', এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১১, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১১৬।

৪. শশাঙ্কশেখর, হিরন্ময় এবং রমাপদ চৌধুরী, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দীপঙ্কর দাস, মুখোমুখি, সাপ্তাহিক বর্তমান ২১শে অক্টোবর ১৯৮৯, সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্ত, বর্তমান প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, পৃ. ১৮।

৫. তদেব, পৃ. ১৮।

৬. রমাপদ চৌধুরী, 'ঋষি, দস্যু, এক কিশোর বালক', এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১১, ১ম প্রকাশ, পৃ. ৩৭।

৭. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৬, দ্বিতীয় নতুন সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৮৭১।

৮. রমাপদ চৌধুরী, 'লেখালেখি', এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১১, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১২১।

৯. তদেব, পৃ. ১১৬।

১০. তদেব, পৃ. ১২৭।

১১. তদেব, পৃ. ১২৮।

১২. শম্পা চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১০, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৩।

১৩. রমাপদ চৌধুরী, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৬, দ্বিতীয় নতুন সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৮৭২।

১৪. রমাপদ চৌধুরী, 'রমাপদ চৌধুরীর মুখোমুখি বিবেক চট্টোপাধ্যায়', উজাগর, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয়, ১৪২০, পৃ. ২৯।